মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল

জে.এস.সি পরীক্ষা ২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

০১। পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়নের পূর্বে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল্যায়ন নির্দেশনা গভীর মনোযোগের সাথে পড়ে নিবেন। নিজের অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন।

০২। পরীক্ষকের নিজের জ্ঞানের বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। পরীক্ষককে সঠিক বিকল্প উত্তর বিবেচনায় এনে নম্বর প্রদান করতে হবে।

০৩। উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও উপস্থাপন কৌশল বিবেচনায় আনতে হবে।

০৪। দক্ষতার স্তরের (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতা স্তর অনুযায়ী লিখতে পারলে ঐ দক্ষতা স্তরের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর পাবে।

০৫। কোন প্রশ্নোত্তর সার্বিকভাবে সঠিক না হলেও চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের বিবেচনায় আংশিক উত্তর সঠিক (ক, খ, গ ও ঘ) প্রশ্নোত্তরের জন্য বরাদ্ধকৃত নম্বর দিতে হবে।

০৬। কোনো উত্তরে ভগ্নাংশ (আধা নম্বর) দেয়া যাবে না।

০৭। প্রত্যেক উত্তরের শুরুতে বামপার্শ্বে ইংরেজীতে নম্বর প্রদান করতে হবে এবং ক, খ, গ ও ঘ এর প্রাপ্ত নম্বর প্রশ্ন নম্বরের বাম পার্শ্বে যোগ দিয়ে দেখাতে হবে। যেমনঃ $1 + 2 + 3 + 4 = 10$

০৮। ক, খ, গ ও ঘ এর প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল ইংরেজীতে কভার পৃষ্ঠার নির্দিষ্ট জায়গায় বামদিকে চাপিয়ে লিখতে হবে।

০৯। কভার পৃষ্ঠায় মোট নম্বর যোগ করে কম্পিউটার শীটে তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লিখে নির্দিষ্ট বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

১০। প্রধান পরীক্ষকের জন্য নির্ধারিত প্রাপ্ত নম্বরের ঘরে পরীক্ষক গণকিছু লিখবেন না।

১১। উত্তরপত্রে কভার পৃষ্ঠা বা অন্য কোথাও কোন অবস্থাতে ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না।

১২। নম্বর প্রদানে ঘষা মাজা বা ওভার রাইটিং করা যাবে না। একান্ত পরিবর্তন করতে হলে এক টানে কেটে নিয়ে পরিবর্তিত নম্বর লিখে স্বাক্ষর করতে হবে।

১৩। উত্তরপত্রের ভিতর লাল বলপয়েন্ট পেন দিয়ে নম্বর প্রদান করতে হবে এবং কভার পৃষ্ঠায় কালো কালির বলপয়েন্ট পেন ব্যবহার করতে হবে।

১৪। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনীর প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল কভার পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত নম্বরের ঘরে লিখে বৃত্তটি ভরাট করতে হবে।

১৫। পরীক্ষককে নির্দিষ্ট জায়গায় অবশ্যই স্বাক্ষর করতে হবে।

১৬। উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজটি অত্যন্ত সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার সাথে করতে হবে।

১৭। যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রধান পরীক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

১৮। উত্তরপত্র গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ১২ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২০/১১/১৭ থেকে ০১/১২/১৭ ইং তারিখের মধ্যে প্রধান পরীক্ষকগণের নিকট অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। সকল উত্তরপত্র ১ কিস্তিতে জমা দিতে হবে। কোনক্রমেই ১ দিনও বিলম্ব করা যাবে না।

১৯। পরীক্ষার্থীদের বয়স ও শ্রেণির মানের দিকে লক্ষ্য রেখে মূল্যায়ন করতে হবে। পাশাপাশি মেধার যাতে মূল্যায়ন হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২০। পরীক্ষকগণ নিজ নিজ সচল মোবইল নম্বর স্ব স্ব প্রধান পরীক্ষকের নিকট প্রদান করবেন।

২১। বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাসের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

বিঃ দ্রঃ ২০১৬ সালের সিলেবাসের বহুনির্বাচনী ১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে খ ও গ উভয় উত্তরই সঠিক হবে।

মাধ্যমিক ওউচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল।

জে.এস.সি পরীক্ষা-২০১৭

বহুনির্বাচনী (২০১৭ শিক্ষা বর্ষ)

পুর্ণমান-৩০

প্রশ্ন নং	সঠিক উত্তর	প্রশ্ন নং	সঠিক উত্তর
০১	ক	২১	ঘ
০২	ঘ	২২	খ
০৩	গ	২৩	ঘ
০৪	ক	২৪	ঘ
০৫	খ	২৫	খ
০৬	ক	২৬	ক
০৭	খ	২৭	ঘ
০৮	ক	২৮	ক
০৯	ঘ	২৯	ক
১০	ঘ	৩০	ক
১১	গ	৩১	
১২	খ	৩২	
১৩	খ	৩৩	
১৪	ক	৩৪	
১৫	ঘ	৩৫	
১৬	গ	৩৬	
১৭	খ	৩৭	
১৮	খ	৩৮	
১৯	গ	৩৯	
২০	খ	৪০	

জে.এস.সি পরীক্ষা ২০১৭
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল
বিষয়ঃ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা(সৃজনশীল)
পূর্ণমান- ৭০

১ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

আল্লাহু মুহাইমিনুন অর্থ: আল্লাহ আশ্রয়দাতা/ আল্লাহ নিরাপত্তাদানকারী/ আল্লাহ রক্ষণাবেক্ষণকারী।

(খ)

ইমানের তিনটি দিক রয়েছে যথাঃ (১) অন্তরে বিশ্বাস করা (২) মুখে স্বীকার করা (৩) তদানুসারে আমল করা।
ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং তদানুযায়ী আমল করার নাম হচ্ছে ইমান। প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য এ তিনটি বিষয় ইমান থাকা জরুরি। কেউ যদি শুধু অন্তরে বিশ্বাসা করে, কিন্তু মুখে স্বীকার না করে তবে সে প্রকৃত ইমানদার বা মুমিন হিসাবে গন্য হয়না। আবার মুখে স্বীকার করে অন্তরে বিশ্বাস না করলেও কোনো ব্যাক্তি ইমানদার হতে পারেনা। বস্তুত আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং তদানুযায়ী আমলের সমষ্টিই হলো প্রকৃত ইমান।

(গ)

সামিয়ার আচরনে নিফাক প্রতিফলিত হয়েছে, কারণ সামিয়া নিয়মিত সালাত আদায় করলে ও সে প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। যা মুনাফিকের চিহ্ন।
রাসুল (সঃ) বলেছেন- মুনাফিকের আলামত বা চিহ্ন তিনটি-(১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে তখন ওয়াদা ভঙ্গ করে (৩) যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে (বুখারী)
মুনাফিকরা ইসলামের চরম শত্রু। এরা বাইরে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা কাফিরদের পক্ষেই কাজ করে। তাদের গোপন শত্রুতা মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। ইসলাম ও মুসলমানদের গোপন কথা ও দুর্বলতা কাফিরদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। তারা মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেয়।
উদ্দীপকে সামিয়া মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। প্রকাশ্যে শত্রুর তুলনায় গোপন শত্রু ভয়ানক। প্রকাশ্য শত্রুর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সাবধান হওয়া যায়। কিন্তু গোপন শত্রুকে চিনতে পারা যেমন কঠিন তেমনি তার ক্ষতি থেকে বাঁচাও কঠিন কাজ। মুনাফিকরা বন্ধু সেজে সহজেই মুসলমানদের বড় ধরণের ক্ষতি করতে পারে। এসব কারণে মুনাফিকরা ঘৃনিত ও নিন্দিত হয়। কেউ তাদের বিশ্বাস করেনা। পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহপাক বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে'।
সুতরাং সামিয়ার কর্মকান্ড দ্বারা তাকে মুনাফিক হিসেবে গন্য করা যায়। সামিয়ার এসব কাজ পরিহার করা প্রয়োজন, নতুবা সামিয়ার জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

(ঘ)

নাছিহার সর্বশেষ বক্তব্য হচ্ছে- "প্রকাশ্যে শত্রুর তুলনায় গোপনে শত্রু বেশি ক্ষতিকর" কথাটি যথার্থ।
প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। গোপন শত্রুকে চেনা যায়না, গোপন শত্রু বন্ধু বেশে ভিতরে থেকে দুর্বলতাগুলো জেনে যায় এবং সহজেই অনিষ্ট বা ক্ষতিসাধন করতে পারে। তার অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় খুবই কম। আমাদের সমাজে এ ধরণের গোপন শত্রুরাই হচ্ছে মুনাফিক। আল্লাহ বলেনঃ "মুনাফিকরা যখন ইমানদারদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরাতো ইমান এনেছি। আবার যখন কাফিরদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরাতো তোমাদের সাথেই আছি। তাদের সাথে কেবল ঠাট্টা বিদ্রুপ করছি"।

উদ্দীপকে নাছিহা সামিয়াকে নিফাকী ত্যাগ করার জন্য নির্দেশনা দেয় এবং সে বলে প্রকাশ্য শত্রুর তুলনায় গোপন শত্রু বেশি ক্ষতিকর। অতএব গোপন শত্রুতা ত্যাগ করা উচিত। রাসুল (সঃ) এর সময় অনেক মুনাফিক ছিল যারা মুসলমান দাবী করে রাসুল (সঃ) এবং ইমানদারদের মজলিসে বসত এবং গোপন তথ্য সংগ্রহ করে কাফিরদের নিকট পাচার করত। ফলে অনেক ক্ষেত্রে রাসুল (সঃ) ও মুসলমানগন বিপদে পড়তেন। একবার চিহ্নিত হলে মুনাফিকদের কেউ বিশ্বাস করেনা, তাদেরকে সন্দেহ ও ঘৃনার চোখে দেখে, সমাজের মানুষের নিকট তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জীবন যাপন করে।

আল্লাহপাক ও এসব গোপন শত্রু তথা মুনাফিকদের জন্য জাহান্নামে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন, আল্লাহ বলেন- নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হবে"।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

শাফাআত অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কল্যান ও ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট নবী-রাসুলগণের সুপারিশ করাকে শাফায়াত বলে।

(খ)

ইমান আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত।ইমানদার ব্যক্তি জান্নাতী হবে।

এর সুফল নানাবিধ, ইমানের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া আখিরাতে কল্যান লাভ করতে পারে।মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে শ্রদ্ধা, সম্মান, কল্যাণ ও সফলতা লাভ করেন, সকলেই তাঁকে ভালোবাসে। আল্লাহপাক বলেন ,"আর সম্মানতো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মুমিনদের জন্যই। মুমিনব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব। আখিরাতে আল্লাহপাক মুমিনদের চিরশান্তির জান্নাত দান করবেন।

(গ)

রায়হানের মনোভাব হচ্ছে-সে খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস করেনা, অথচ খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস করা ইমানের অপরিহার্য অঙ্গ। সে প্রকৃত মুমিন নয়।

মানব জাতির হোদায়াতের জন্য আল্লাহপাক যুগে যুগে বহু নবী-রাসুল প্রেরণ করেন। এ ক্রমধারা শুরু হয় হযরত আদম (আঃ) এর মাধ্যমে এবং শেষ হয় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে। নবুয়ত তথা নবী-রাসুল আগমনের এই ক্রমধারাটির সমাপ্তিই হচ্ছে খতমে নবুয়ত।

উদ্দীপকের রায়হান মনে করে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ আসতে থাকবে তাই কিয়ামত পর্যন্ত নবী-রাসূলও আসতে থাকবে অথচ খাতামুন্নাবিয়্যিন বা নবীদের শেষজন হচ্ছেন আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।

আমদের প্রিয় নবী (সঃ) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী ও রাসুল। তাঁর পর আজ পর্যন্ত আর কোনো নবী রাসুল আসেননি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসবেননা। তাঁর মাধ্যমে নবী-রাসুল আগমনের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাই খতমে নবুয়তে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। এতে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারেনা। আল্লাহপাক বলেনঃ "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি তো আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী"। মহানবি (সঃ) বলেন-"আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী-রাসুল আসবেননা (সহীহ মুসলিম)

(ঘ)

রাজিবের মনোভাব ইমানের সাতটি বিষয়ের অন্যতম বিষয় তাকদীরে বিশ্বাস এর প্রতি পূর্ণসমর্থন প্রমান করে।

রাজিব বিশ্বাস করে মানুষের ভালো মন্দ তার তাকদির বা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল এবং সাথে সাথে কর্ম বা কাজও বাদ দেয়া যাবেনা। তাকদির আল্লাহ পাক থেকে নির্ধারিত, ভালো মন্দ যা কিছু হয় আল্লাহ তায়ালার হুকুমে হয়। সুতরাং দুনিয়াতে ভালো কিছু লাভ করলে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যাবেনা। বরং এটি আল্লাহের দান মনে করে আল্লাহর শুকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। উদ্দীপকের রাজিবও মনে করে মানুষের ভাল মন্দ তার তাকদিরের ওপর যেমন নির্ভরশীল তেমনি তার কাজ কর্মের উপরও। অন্যদিকে বিপদে আপদে বা কোন ক্ষতির সম্মুখীন হলে হতাশ হওয়া যাবেনা। অন্যায় ও দুর্নীতি করা যাবেনা। এ অবস্থায় সবর বা ধৈর্য ধরতে হবে, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে এবং আল্লাহর হুকুম মত যাবতীয় কার্যক্রম করতে হবে। অলসতা বা কুঁড়েমি বর্জন করতে হবে। সাধ্যমত যার যা করণীয় তা করতে হবে। তাকদিরের দোহাই দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেও চলবেনা।

সুতরাং আমদেরকে আল্লাহর নির্দেশ মত কাজ করতে হবে এবং ফলাফলের জন্য তাকদিরের উপর ভরসা করতে হবে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

ইহরাম বাঁধার পর মক্কা পৌছে কাবা ঘরের চারদিকে প্রথম যে তাওয়াফ করতে হয় তাকে তাওয়াফে কুদুম বলা হয়। মক্কায় পৌছার পর এটি প্রথম তাওয়াফ বিধায় একে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনি তাওয়াফ বলা হয়।

(খ)

আকিকা অর্থ ভাঙ্গা, কেটে ফেলা ইত্যাদি,"ইসলামি পরিভাষায় সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনে তার কল্যান কামনা করে আল্লাহর নামে কোনো হালাল গৃহপালিত পশু জবাই করাকে আকিকা বলা হয়।

আকিকা করা সুন্নত। এর দ্বারা সন্তানের বিপদাপদ দূর হয়। কাজেই প্রত্যেক পিতামাতার উচিত নবজাতক সন্তানের নামে যথা সময়ে আকিকা করা।

(গ)

কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী জনাব ফাহিমের যাকাত আদায় হয়নি।

মসজিদ নির্মানের কাজে দান করা অনেক পূণ্যের কাজ কিন্তু এই কাজে যাকাতের অর্থ খরচ করা যাবেনা। যাকাতের অর্থ গরিবের হক, আল্লাহপাক বলেন-"তাদের(ধনীদের) ধন-সম্পদে অবশ্যই দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" (সুরা আয-যারিয়াত) রাসুল (সঃ) বলেছেন আল্লাহতায়ালা লোকের উপর যাকাত ফরয করেছেন, তা নেওয়া হবে ধনীদের থেকে এবং বিলিয়ে দেওয়া হবে দুঃস্থদের মাঝে।(বুখরী ও মুসলিম)

তাছাড়া আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে যাকাতের মাসারিফ তথা কোন কোন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআনে এভাবেই বলা হয়েছে: "যাকাত তো কেবল নিঃস্ব,অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসফিরদের জন্য, ইহা আল্লাহর বিধান"।(সূরা আত তাওবা) অথচ জনাব ফাহিম শুধু মসজিদ নির্মাণের কাজে হিসাব-নিকাশ ছাড়াই যাকাতের অর্থ খরচ করেন।

যেহেতু মসজিদ নির্মানের কাজ যাকাতের মাসারিফের অন্তর্ভূক্ত নয়। সুতরাং জনাব ফাহিমের যাকাত আদায় হয়নি, তাছাড়াও যাকাত দিতে হয় সমস্ত সম্পদের হিসাব করে তিনি সেটি ও করেননি।

(ঘ)

উদ্দীপকে বর্নিত জনাব রাশেদের বক্তব্য ইসলামের আলোকে যথার্থ।

যাকাতের অন্যতম গুরুত্ব হলো অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। সমাজের কেউ সম্পদের পাহাড় গড়বে, সুউচ্চ প্রাসাদে বসবাস করবে, বিলাসবহুল জীবন-যাপন করবে আর কেউ অনাহার, অর্ধাহারে দিন কাটাবে এমন বিধান ইসলামে নেই। কেউ শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরন করতে পারবেনা। আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা করবে, শান্তি ও সাম্যের ধর্ম ইসলাম তা কিছুতেই সমর্থন করেনা। কাজেই সকল শ্রেণির নাগরিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দুর করে ভারসাম্য রক্ষার জন্য ইসলাম ধনীদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন। তা নেওয়া হবে ধনীদের থেকে এবং বিলিয়ে দেয়া হবে দুঃস্থদের মধ্যে।

উদ্দীপকে রাশেদ ফাহিমের অবস্থা দেখে বলেন- আল্লাহতায়ালা সমাজের ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করার জন্যই যাকাতের বিধান ধনীদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন।

হাদিসে কুদসীতে আছে-"আল্লাহ তাঁর বান্দাকে বলেন, বনী আদম আমার পথে খরচ করতে থাক, আমি আমার অফুরন্ত ভান্ডার থেকে তোমাদের দিতে থাকব"।

মূলত যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ ব্যক্তি বিশেষের হাতে পুঞ্জীভূত থাকেনা। আর মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকুক আল্লাহপাক তা চাননা। তিনি চান এটা মানুষের কল্যানে ব্যয় হোক, সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হোক। অন্যদিকে যাকাতের অর্থ গরীব শ্রেণিপেয়ে তা ভোগ করার পাশাপাশি বিনিয়োগ ও করতে পারে। ফলে সে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এতে দেশের ক্ষুদ্র অর্থনীতি গতিশীল হয়। ফলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর হওয়ার একটি মহা সুযোগ সৃষ্টি হয়।

অতএব, ধনী ব্যক্তিদের উচিত যথাযথ ভাবে সম্পদের হিসাব করে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে গরীবের অভাব দূর করা এবং স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করা।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট দিন সমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহে বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করাকে হজ্জ বলে হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও শারীরিক ইবাদাত।

(খ)

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলে। আখিরাত আকাইদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আখিরাতের প্রতি ইমান আনা ফরজ। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎ কর্মশীল করে তোলে। এর ফলে মানুষ উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার গুণাবলী অনুশীলন করে। আল্লাহপাক বলেন-"আর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী"।

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। কারণ আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয়ে মানুষ মন্দ কাজকরা থেকে দুরে থাকে। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ দুনিয়াকেই সব কিছু মনে করে। ফলে যেকোন উপায়ে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করতে চায়। অন্যায় অত্যাচার অনৈতিক কার্যকলাপ সবকিছুই তার দ্বারা সংঘটিত হয়। আর আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে এরূপ কাজ করা থেকে বিরত রাখে এবং পবিত্র করে তোলে।

(গ)

নওরিনের পিতা ও চাচা কুরবানী করেছেন। কুরবানী একটি ওয়াজিব ইবাদাত।

যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ সকাল থেকে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যে পশু জবাই করা হয় তাকে কুরবানী বলে।

বর্তমানে যে কুরবানী প্রথা প্রচলিত আছে, তা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকে চলে আসছে। এটি আত্মত্যাগ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। এটি একটি উত্তম ইবাদত। রাসুল (সঃ) বলেন-"কুরবানীর দিনে রক্তপ্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় কাজ আল্লাহর নিকট আর কিছুই নেই। ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর শিং,ক্ষুর ও লোম সমূহ নিয়ে হাজির হবে। কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌছে যায়। অতএব তোমরা কুরবানির দ্বারা নিজেদেরকে পবিত্র কর। উদ্দীপকে নওরিনের বাবা ও চাচা যে কোরবানী করেছেন তা একটি ওয়াজিব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি মূলক ইবাদত। রাসুল (সঃ) আরও বলেন- "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কোরবানী করলনা সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়"।

সুতরাং আমাদের সকলের সামর্থ্য থাকা সাপেক্ষে কোরবানী করা উচিত।

(ঘ)

শারমিনের কাজের মাধ্যমে আকিকা পালন করা হয়েছে। আকিকার অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

আকিকা করা সুন্নাত। এর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়। সন্তানের বিপাদপদ দূর হয়। কাজেই প্রত্যেক পিতা মাতার উচিত নবজাতক সন্তানের নামে যথাসময়ে আকিকা করা। হাদিসে আছে,"প্রতিটি নবজাতক সন্তান আকিকার সাথে সম্পৃক্ত। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে পশু জবাই করতে হবে। তার নাম রাখা হবে, তার মাথার চুলমুন্ডন করা হবে"। নবী করিম (সঃ) এর আগেও আকিকার প্রচলন ছিল। আল্লাহতায়ালার অনুমতিতে মহানবী (সঃ) তা চালু রাখেন। মহানবি (সঃ) নিজে আকিকা করেছেন, অন্যকেও আকিকা করার উৎসাহ দিয়েছেন। পিতা-মাতা আকিকা না করলে নিজের আকিকা নিজেই করা যায়। রাসূল (সঃ) নবী হওয়ার পর নিজের আকিকা নিজেই করেছেন।

উদ্দীপকে শারমিন তার সন্তানের দায়িত্ব পালন করার জন্য দুটি ছাগল জবাই করে আকিকা নামক সুন্নত কাজটি আদায় করেছেন। আকিকা সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে করা মুস্তাহাব। সপ্তম দিনে না পারলে, ১৪,২১ তারিখেও করা যায়। মাতা-পিতার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সন্তান, সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করা উত্তম। তার মধ্যে আকিকা অন্যতম। সুতরাং প্রত্যেক পিতা-মাতার এ বিষটি গুরুত্ব দিয়ে আকিকা করা উচিত।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

নাযিরা তিলাওয়াত হলো দেখে দেখে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা। কুরআন মাজীদ দেখে দেখে তিলাওয়াত করা উত্তম। কারণ দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াতে ভুল কম হয়।

(খ)

নিসাব আরবী শব্দ এর অর্থ নির্ধারিত পরিমান, শরিয়তের পরিভাষায় যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নির্ধারিত পরিমান কে নিসাব বলে।

সারা বছর জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর বছর শেষে যার হাতে নিসাব পরিমান সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে তাকে বলা হয় সাহিবে নিসাব বা নিসাবের মালিক। আর সাহিবে নিসাবের উপরই যাকাত ফরজ। নিসাবের পরিমান হলো সোনা কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা অথবা রূপা কমপক্ষে সাড়ে বায়ান্ন তোলা অথবা ঐ মূল্যের নগদ অর্থ। ঐ পরিমান

সম্পদ কারো নিকট পূর্ণ এক বছরকাল স্থায়ী থাকলে ঐ সোনা,রূপা বা সম্পদের মূল্যের চল্লিশভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দেওয়া ফরয।

(গ)

সুমনের কর্মকান্ডে শ্রমিকের পারিশ্রমিক দ্রুত আদায়ের তাগিদ দিয়ে মহানবী (সঃ) যে হাদিস বলেছেন তার বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে।

মহানবি (সঃ) বলেন:"শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়র পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও"। এ নৈতিক শিক্ষামূলক হাদিস অনুযায়ী প্রত্যেক মালিকের উচিত যথাসময়ে শ্রমিকের মজুরী আদায় করা। অথচ সুমন তার চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সময়মতো দেননা, তাদের পারিশ্রমিক দিতে গড়িমসি করেন। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দ্বারাই তারা নিজেরা জীবিকা নির্বাহ করে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের যাবতীয় চাহিদা মিটিয়ে থাকে। সুতরাং তারা সময়মত পারিশ্রমিক না পেলে তাদের পরিবারের সদস্যরা এবং তারা নিজেরা কষ্ট পান। তাই সকল মালিকের উচিত শ্রমিকদের মর্যাদা প্রদান করা এবং সময়মত মজুরী প্রদান করা।

(ঘ)

জনাব রোমানের চরিত্রে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট বিদ্যমান রয়েছে।

তিনি অত্যন্ত ন্যায়বিচারক খলিফা ছিলেন। তিনি সর্বদা জনসাধারণের কল্যানার্থে কাজ করেন। তিনি উমাইয়া বংশের খলীফা হওয়া সত্ত্বেও উমাইয়া বংশের লোকজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভাবে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের যে সকল সম্পদ দখল করে রেখেছিল তিনি তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এবং যথাযথ মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। উমর ইবনে আবদুল আজিজ বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। তিনি গভর্ণরদের নিকট প্রেরিত পত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বারবার তাগিদ দিতেন। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে তিনি অনেক প্রশিক্ষক নিয়োগ করেন। তিনি মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দৈনিক মাত্র দু-দিরহাম ভাতা গ্রহণ করতেন অথচ শিক্ষকদের জন্য মাথাপিছু মাসিক ১০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ভাতার ব্যবস্থা করেন। তার সময়ে যাকাত নেয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেতনা।

উদ্দীপকের রোমান সাহেবও সামাজিক বিচারকার্য ন্যায়পরায়ণতার সাথে করেন। তার আচরণে সকলে মুগ্ধ। তিনি জ্ঞানীদের যথার্থ মর্যাদা দেন। নিজে যে ভাতা গ্রহণ করেন তার চেয়ে অনেক বেশি ভাতা জ্ঞানীলোকদের জন্য মঞ্জুর করেন। তার গৃহীত পদক্ষেপের কারণে তার এলাকার লোকজন আর্থিকভাবেও বেশ স্বচ্ছল। তাদের অভাব অনটন না থাকায় যাকাত গ্রহণ করার মত লোক তার এলাকায় খুঁজে পাওয়া যেত না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রোমান সাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন কর্মকান্ড ৫ম খালীফা বলে খ্যাত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে অনেকটা মিল রয়েছে।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

ইমানের মূল কথা হলো কালিমায়ে তাইয়েবা অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসুল।

(খ)

কুরআন শব্দের অর্থ হলো পঠিত। আলকুরআন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পঠিত কিতাব।

প্রতিদিন লক্ষ কোটি মুসলমান এই গ্রন্থ পাঠ করে থাকে। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এই কুরআন থেকে বিভিন্ন সূরা বা আয়াত পাঠ করে থাকি। এজন্যই কুরআন মাজিদের নাম রাখা হয়েছে "আল কুরআন"।

(গ)

আবু আহসান তার বাবার কাছ থেকে শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য তাজবীদের জ্ঞান অর্জন করেছে। শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হলে তাজবীদের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী।আবু আহসানের বাবা কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন আর বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতিই হচ্ছে তাজবীদ। আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অনেক। কিন্তু এই ফজিলত লাভের জন্য সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। তাজবিদ অনুসারে কুরআন তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। তাজবীদ অনুসারে কুরআন তিলাওয়াত না করলে পাঠকারী গুনাহগার হবে এবং তার নামাজ শুদ্ধ হবেনা। আহসান এজন্য প্রথমে তার বাবার কাছ থেকে শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত শিখেন। তাজবীদ অনুসারে কুরআন তিলাওয়াত করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন-"আপনি ধীরেধীরে এবং সুস্পস্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করুন"। রাসুল (সঃ) বলেন, ইলমে কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতাদের

দলভুক্ত, যারা নেককার ও আল্লাহর হুকুমে লেখার কাজে ব্যস্ত। আর যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া সত্বেও বারবার চেষ্টা করে কুরআন তিলাওয়াত করে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে"।

সুতরাং আমরা বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য তাজবীদের জ্ঞান অর্জন করব।

(ঘ)

উদ্দীপকে উল্লেখিত আবু আহসানের ভাই আবু রায়হানের মনোভাব কুরআনের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে যথাযথ। আলকুরআন শুধু তিলওয়াত করার জন্যই অবতীর্ন হয়নি। কুরআন মাজীদ জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস। এটি যাবতীয় জ্ঞানের ভান্ডার , সাথে সাথে এটি মানবজাতির হিদায়াতের প্রধান উৎস। কোন পথে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যান লাভ করবে আল কুরআন তা দেখিয়ে দেয়। আল কুরআনের নির্দেশ মতো চললে আমরা কল্যান লাভ করতে পারি। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল কুরআনের নির্দেশ মেনে চলবে সে হবে মহাভাগ্যবান। সে পাবে চির শান্তির জান্নাত। আলকুরআন ইসলামী শরীয়াতের প্রধান উৎস। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন কেমন হবে তা এই কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষ কীভাবে ইবাদাত করে, কীভাবে চরিত্র গঠন করবে তাও এ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। এসব বিষয় জানতে হলে কুরআন বুঝে-শুনে পড়তে হবে, এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানতে হবে, শানে নুযুল জানতে হবে।

উদ্দীপকের আবু রায়হান তাই অর্থ বুঝে কুরআনের জ্ঞানার্জন তৎপর হয়, কারন সে জানে আলকুরআন জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস এবং মানবজাতির মুক্তির সনদ। যাতে সে দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে পারে।

সুতরাং আমরাও অর্থবুঝে কুরআন তেলাওয়াত করায় মনোযোগী হব।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

ধৈর্য এর আরবী প্রতিশব্দ হলো সবর/ ছবর/

(খ)

"চরিত্র মানুষের ভূষণ" উক্তিটি যথার্থ।

ভূষণ বলতে এখানে ব্যক্তির পরিচ্ছদ বা সৌন্দর্য বোধ বা সুশোভনের বিষয়টি বলা হয়েছে। পোশাক দ্বারা মানুষ সৌন্দর্য প্রদর্শণ করে। আর উত্তম চরিত্র দ্বারা মানুষের মানবীয় গুনাবলি সুশোভিত হয়। এজন্যই চরিত্রকে মানুষের ভূষণ বলা হয়।

(গ)

ফরহাদ সাহেবের চিন্তার বিষয়টি খুবই ইতিবাচক এবং ইসলাম সম্মত। এখানে নারীর মর্যাদার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ইসলাম নারীকে সর্বশ্রেষ্ট মর্যাদার আসনে আসীন করে। পবিত্র কুরআন মাজীদে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহন করলে মনোকষ্টে না ভোগার নির্দেশ দিয়েছে। (নাহল-৫৮৫)। মহানবি (সঃ) বলেছেন, মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। তাই দেখা যায়, কুরআন ও হাদীসে নারীকে অধিক মর্যাদাবান করেছে। উদ্দীপকে "কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করা ইসলামে খুবই নিন্দনীয় কাজ" কথাটি যথার্থ। আজকে যে কন্যা আগামিদিন সে স্ত্রী, পরবর্তীতে সে মা। সুতরাং কন্যাকে অপছন্দ করা মানে মা-কেই অপছন্দ করা।

পরিশেষে মহানবি (সঃ) এর কথাই উল্লেখ করব যে, মহানবি (সঃ) মায়ের মর্যাদার কথা তিনবার বলেছেন আর পিতার মর্যাদার কথা একবার বলেছেন।

সুতরাং আমাদের কন্যা সন্তানদের মর্যাদা প্রদান করতে হবে।

(ঘ)

শাহিন একজন পরশ্রীকাতর ব্যক্তি- উদ্দীপকের আলোকে কথাটি যথার্থ। কেননা পরশ্রীকাতর ব্যক্তি কখনো অন্যের ভালো দেখতে পারেনা।

পরশ্রীকাতরতা অর্থ হলো অন্যের উন্নতি বা শ্রী বা সৌন্দর্য বা সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষা পোষণ করা। শাহিন এমন একজন ব্যক্তি যে অণ্যের উন্নতি দেখতে পারেনা। পরশ্রীকাতরতা শুধু ব্যক্তি ব্যধি নয় এটি সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় এমনকি আন্তর্জাতিক ব্যধিও বলা যায়। কেননা এক রাষ্ট্রের উন্নতি দেখলে অন্য রাষ্ট্র ঈর্ষান্বিত হয়, পরশ্রীকাতরতা দ্বারা শত্রুতা, অহংকার, অনাচার, অত্যাচার, সন্ত্রাস ইত্যাদি বেড়ে যায়।

উদ্দীপকে শাহিন মেডিকেল পড়ুয়া ছেলেটির খারাপ কামনা করা দ্বারা শাহিনের পরশ্রীকাতরতার চরিত্র ফুটে উঠেছে। এটি ঠিক নয়। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে সু-নজরে থাকা উচিত, সু-নজরের মাধ্যমে মানুষের মঙ্গল দেখা উচিত।

পরশ্রীকাতরতা ইবলিস শয়তানের কাজ। সূরা ফালাকে পরশ্রীকাতর ব্যক্তি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার জন্য আমাদেরকে শেখানো হয়েছে।

তাই বলতে হয়, পরশ্রীকাতরতা পরিহার করে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পেতে সকলকে পরশ্রীকাতরতা পরিহার করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ হতে হবে।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

সন্ত্রাস এর আরবী শব্দ হলো আল ইরহাব।

(খ)

পরশ্রীকাতরতা একটি মারাত্মক ব্যধি।

পরশ্রীকাতরতা অর্থ হলো অন্যের উন্নতি দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া, হিংসা করা, এর দ্বারা সামাজিক এবং পারিবারিক কোন্দল সৃষ্টি হয়, অন্যের সম্পদের উন্নতি দেখে, ব্যবসায়/ চাকুরির উন্নতি দেখে এক শ্রেণির লোক ঈর্ষান্বিত হয়। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি শয়তানের দোসর। কাজেই সে যাতে ব্যধি ছড়িয়ে দিতে না পারে সে জন্য তাকে পরিহার করা উচিত।

(গ)

রায়হানার ঘটনার সাথে হযরত আয়িশা (রাঃ) এর ঘটনার মিল রয়েছে।

হযরত আয়িশা (রাঃ) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সর্ব কণিষ্ঠা স্ত্রী ছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) এর কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শালীন, ছোট বেলা থেকেই তাঁর আচার-আচরণ, কথা-বার্তা সকলকে মুগ্ধ করত। তিনি ছিলেন প্রখর মেধাসম্পন্ন বিচক্ষণ, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং প্রজ্ঞার অধিকারিণী। তিনি নারীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। সাথে সাথে তাফসীর এবং ফিকাহুশাস্ত্র ও বিভিন্ন মাসালায় পারদর্শী ছিলেন।

উদ্দীপকে দুষ্ট লোকেরা রায়হানা ও তার পরিবারকে হেয় করার জন্য তার চরিত্র নিয়ে যে অপবাদ দেয় তার সাথে হযরত আয়িশা(রাঃ) এর ইফকের ঘটনার মিল রয়েছে। ষষ্ঠ হিজরিতে বনু মুস্তালিক যুদ্ধের সময় ফেরার পথে হযরত আয়িশা (রাঃ) এর গলার হার হারিয়ে গেলে তা খুঁজতে গিয়ে কাফেলার সাথে ফিরতে না পারলে মুনাফিকরা তার চরিত্র নিয়ে অপবাদ রটায়, এতে হযরত আয়িশা (রঃ) মানসিক বিপর্যয়ের মুখে পড়লে সূরা নূরে ১১-২১ নং আয়াতে আল্লাহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল করেন।

তাই বলা যায়, না জেনে না বুঝে আমরা কারও উপর অযথা অপবাদ বা গীবত রটাবো না। এতে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

(ঘ)

সুমাইয়া অশালীণ চলাফেরা ইসলামসম্মত নয়। এটি ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম।

অশালীন অর্থ অশ্লীলতা, জঘন্যতা, কুৎসিত আচরণ। অশালীণ চলাফেরা মারাত্মক অপরাধ, অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকতে সূরা আনআমে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, "অশ্লীল আচরণকারী সকলের নিকট ঘৃনিত"। মাহানবি (সঃ) বলেছেন- "প্রত্যেক অশ্লীল আচরনকারীর জন্য জান্নাতে প্রবেশ হারাম"।

উদ্দীপকে সুমাইয়া অশালীণ চলাফেরা করে তাই সবাই তাকে ঘৃনা করে একথা বলা হয়েছে, আমাদের সমাজ আসলেই এখনো একটি আদর্শিক সমাজ, এ সমাজে অশালীনতার কোন স্থান নেই। আমাদের পাঠ্য বইতেও অশালীনতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, অশালীনতার কারণে সামাজে শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। কু-কর্মের প্রকাশ পায়, সমাজ কলুষিত হয়, বড়দের কুকর্মের প্রতি ছোটরা প্রলুব্দ হয়। মানুষ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, কুরুচির দিকে ধাবমান হয়। তাই বলতে হয় অশ্লীলতার কাছেও যাওয়া যাবে না। ইহাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। ইহা থেকে মুক্তি পেতে আইনি প্রতিকার, পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সর্বোপরি ব্যক্তিজীবনে ইসলামের নীতি ও আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

HIV পূর্ণরূপ হচ্ছে Human Immune Deficiency Virous.

(খ)

সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় কথাটির যথার্থতা রয়েছে।

সত্যবাদিতা একটি মহৎগুণ, সত্যবাদিতার সুফল অনেক। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে, সবাই তাকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। অপরদিকে মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসেনা বিশ্বাস করেনা, আমরা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর সত্য বলার মাধ্যমে কীভাবে ডাকাতদল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন সেই ঘটনা জানি। সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত হয়, মর্যাদা লাভ করে আর আখিরাতে সত্যবাদিতার পুরস্কার হলো জান্নাত।

(গ)

মাহিনের কাজে মহানবি (সঃ) এর বিদায় হজ্জের ভাষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

মহানবি (সঃ) ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৯ জিলহজ্জ আরাফাত ময়দানে উপস্থিত জনসমুদ্রের সামনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাকে বিদায় হজ্জের ভাষণ বলা হয়। উক্ত ভাষণে তিনি ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সর্বপ্রকারের দায়িত্ব, লেনদেন, পারস্পারিক সম্পর্ক ও অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। তিনি বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। তিনি দাস দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করার উপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোন অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবু তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবেনা। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি।

তাছাড়া তিনি স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন- স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনই তোমাদের ওপর তাদের অধিকার রয়েছে। অথচ উদ্দীপকে জনাব মাহিন সবসময় নিজের বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চান, তিনি কাজের লোকদের প্রতি খুবই রুঢ় আচরন করেন। সামান্য ভুলত্রুটি হলে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। স্বীয় স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করেননা। এতে প্রতীয়মান হয় জনাব মাহিনের চরিত্রে মহানবি (সঃ) এর বিদায় হজ্জের ভাষণের অভাব প্রচন্ডভাবে রয়েছে।

অতএব, জনাব মাহিনের উচিত মহানবি (সঃ) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ অনুযায়ী তার চরিত্র গঠন করা।

(ঘ)

উদ্দীপকের সর্বশেষ বাক্যটি কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী যথাযথ।

মহানবি (সঃ) বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত হিসেবে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তিনি নারীদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ইসলাম পূর্ব যুগে আমাদের অনেক গোত্র ও সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদাই ছিলনা। তারা কেবল ভোগের পাত্রী ছিলেন। উত্তরাধিকারী সম্পত্তি হতে তারা
বঞ্চিত ছিলেন। মহানবি (সঃ) নারীদের এসব দূর্গতি হতে রক্ষা করেন। তিনি তাদের ধর্মীয় সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেন। তিনি ঘোষনা করেন "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত"।

মহানবি (সঃ) কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেওয়া বন্ধ করেন, কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াকে অভিশাপের পরিবর্তে সম্মাদের বলে আখ্যা দেন। সুন্দরভাবে কন্যা সন্তানকে লালন পালন করার জন্য বেহেশতের সুসংবাদ দেন। তিনি আল্লাহপাকের ঘোষণা অনুযায়ী স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীর সম্পত্তির যেমন অধিকারী করেন তেমনি পিতা-মাতার সম্পত্তিতেও উত্তরাধীকারীর ঘোষণা দেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন স্ত্রীরা স্বামীদের ভূষণ এবং স্বামীরা স্ত্রীদের ভূষণ। মহানবী বলেন-"তোমরা স্ত্রী লোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে"।

তিনি আরও বলেন-"তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবন-যাপন করবে"। রাসুল (সঃ) স্ত্রীদের প্রতি ভালো ব্যবহারকারীদের উত্তম উম্মত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম,যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।

এসব বিবেচনায় উদ্দীপকের সর্বশেষ বাক্য "মহানবি (সঃ) নারীদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন" কথাটি সত্য ও বাস্তব।

অতএব, আমরা নারীদের সামাজিক অধিকারগুলো আদায়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করব। কেননা নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা ইমানের নিদর্শন, নারীদের প্রতি সম্মানবোধ না থাকলে ইমান পূর্ণ হয়না।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

অশ্লীলতা এর আরবি হলো 'বাজাআতুন'।

(খ)

কাউকে তুচ্ছ মনে করে তাকে সহ্য করতে না পারা এবং তার থেকে দূরে সরে থাকাকেই পরিভাষায় ঘৃনা বা তাচ্ছিল্য বলে।

অহংকার, শত্রুতা, পদমর্যাদা লিপ্সা প্রভৃতি কারণে ঘৃনার উদ্রেক ঘটে। আর ঘৃনা বা তাচ্ছিল্য শয়তানের বৈশিষ্ট্য। শয়তান হযরত আদম (আঃ) এর প্রতি তাচ্ছিল্য করার কারণেই অভিশপ্ত হয়েছে। মহানবী (সঃ) বলেন-"পূর্ববর্তী উম্মতের দুটি রোগ তোমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। হিংসা এবং ঘৃনা"। আমরা কউকে ঘৃনা বা তাচ্ছিল্য করব না।

(গ)

উদ্দীপকে ইকরামের দেশপ্রেমের বিশেষ গুণটি পরিলক্ষিত হয়।

মাতৃভূমি তথা দেশের প্রতি প্রীতি ও দরদের আকর্ষণকেই দেশপ্রেম বলে। দেশপ্রেম মানব জীবনের একটি মহৎ গুণ। দেশ প্রেমের মূলে আছে দেশের ভূখন্ডকে ভলোবাসা, দেশের জনগণকে ভালোবাসা, দেশের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা করা। ইসলাম দেশপ্রেমের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। মহানবি (সঃ) তার জন্মভূমি মক্কাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। মদীনায় হিজরতের সময় মহানবী (সঃ) বারবার মক্কার দিকে তাকান এবং কাতর কণ্ঠে বলেন:"হে আমার স্বদেশ তুমি কত সুন্দর! আমি তোমাকে ভালবাসি, আমার আপন গোত্রীয় লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না"। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশপ্রেমিক নিজের জানমাল উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনা।

উদ্দীপকে ইকরাম ছোটবেলা থেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশ রক্ষার কাজে নিজেকে ন্যস্ত করবে বলে সংকল্প করেছিল। তাই তিনি জীবনের ঝুঁকি জেনেও দেশরক্ষার মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং বাংলাদেশ সেনাবহিনীতে যোগদান করেন।

তাই বুঝা গেল ইকরামের মধ্যে দেশপ্রেমের প্রবল আকর্ষণ ফুটে উঠেছে।

(ঘ)

আকরামের কাজটি হলো ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ। যা ইসলামে হারাম বা অবৈধ। অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত পারিতোষিকই ঘুষ।

ঘুষ একটি সামাজিক অপরাধ। ঘুষ লেনদেনের মাধ্যমে অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন হয়। ঘুষ গ্রহীতাকে সকলে ঘৃনা করে। ঘুষ গ্রহণ এবং দেওয়া দুটোই পাপ। রাসূল (সঃ) বলেন-"ঘুষদাতা ও গ্রহীতার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়"। কোন কর্মচারী তার বেতনের অতিরিক্ত অথবা জনগণ থেকে কোনো কিছু উপঢোকন গ্রহণ করা অবৈধ। রাসূল (সঃ) বলেন "কোনো ব্যক্তিকে যদি আমরা কোনো কাজে নিয়োগ করি এবং এজন্য তাকে বিনিময় দান করি, আর সে বিনিময়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তবে তা খিয়ানত হিসাবে গন্য হবে"। কিয়ামতের দিবসে ঘুষগ্রহীতার পরিণতি হবে খুবই লজ্জাজনক।

উদ্দীপকের আকরাম উৎকোচ ছাড়া ফাইলে কোনো সই করেন না, তার এরূপ অবস্থা দেখে তার স্ত্রী রেহানা বলেন, এটা ইসলামে অবৈধ। উপরোক্ত আলোচনায় আকরামের কাজটি (উৎকোচ গ্রহন) অবৈধ বলে প্রমাণিত এবং তার স্ত্রীর মন্তব্যটি যথাযথ হয়েছে। সুতরাং আমাদের এ ধরণের কাজ পরিহার করে চলতে হবে।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

মুসলিমগণ অমুসলিমদের সাথে কোনো যুদ্ধে অবতীর্ন হয়ে বিজয় লাভ করলে অমুসলিমদের রেখে যাওয়া যে সব সম্পদ মুসলিমগণ হস্তগত করেন তাকে গনিমতের মাল বলে।

(খ)

মহান আল্লাহপাক তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য নবী রাসুলগণকে যে সব অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছেন তাকে মুজিযা বলা হয়। যুগে যুগে প্রেরিত নবীরাসুলগণকে আল্লাহতায়ালা অস্বাভাবিক কিছু শক্তি দান করেছিলেন যাতে মানুষ তাদের অনুসরন করেন। যেমন- মুসা (আঃ) এর হাতের লাঠি সাপে পরিণত হত, ঈসা (আঃ) জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরেগীদের ভালো করতে পারতেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) বাতাসে ভর করে হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে পারতেন,

মহানবি (সঃ) চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করে দেখিয়েছিলেন ইত্যাদি। এসব ক্ষমতা কেবল মাত্র নবী-রাসূলকেই দেয়া হয়েছিল। অন্য কাউকে এসব ক্ষমতা দেয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে মুজিযা ছিল নবী-রাসুল এর সত্যতার প্রমান।

(গ)

উদ্দীপকে উল্লেখিত গৃহকর্মীর জীবনী তাপসী রাবেয়া বসরী (রহঃ)এর জীবনীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

নারীদের মধ্যে যারা আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করেছেন তাদের মধ্যে রাবেয়া বসরী (রহঃ) অন্যতম। তিনি ৯৯ হিজরীতে ইরাকের বসরা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা ছিল খুব দরিদ্র। হযরত রাবেয়া বসরি (রহঃ) এর পিতা-মাতা ইন্তেকালের পর তিনি ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রিত হন। তাঁর মনিব ছিল দুষ্ট প্রকৃতির, তাকে দিয়ে মনিব অনেক কাজ করাত। রাবেয়া বসরি (রহঃ) মনিবের কথামত দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করতেন। তারপর রাতে বিনিদ্র থেকে শুধু আল্লাহর ইবদাত করতেন। একদিন রাতে তাঁর মনিবের ঘুম ভেঙে গেলে তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন রাবেয়া বসরি একনিষ্ঠভাবে আল্লহর ইবাদাত করছে এবং উপর হতে একটি বাতি তার ঘর আলোকিত করে রেখেছে। সে মুনাজাতে বলছে,"হে আল্লাহ তুমি আমাকে কোনো মানুষের অধীন করে না রাখলে আমি সর্বদা তোমার ইবাদাত করতাম। রাবেয়ার মনিব এ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং সকাল বেলা তাঁকে পরিপূর্ণ স্বাধীন করে দিল। এরপর থেকে রাবেয়া সারাজীবন কেবল আল্লাহর ইবদাতে কাটিয়ে দেন। উদ্দীপকের উল্লেখিত আরমান সাহেবের বর্ননায় সেই আদর্শ নারীও গৃহকর্মীর কাজ করত। সারাদিন গৃহকর্মীর কাজ শেষে তিনি রাতের বেলা নির্ঘুম থেকে ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দেন। এক রাতে তাঁর পাষন্ড গৃহকর্তা তাঁর ইবাদতের এই দৃশ্য দেখে ভীত হয়ে যান এবং তাঁর প্রতি সদয় হন। তারপর তাকে কাজ থেকে মুক্ত করে দেন। তিনি সংসার জীবনে প্রবেশ না করে ইবাদাতবন্দেগী করে সারাজীবন কাটিয়ে দেন।

অতএব, উদ্দীপকের উক্ত গৃহকর্মীর জীবনের সাথে হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) এর জীবনের ঘটনাবলী পুরোপুরি সাদৃস্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত।

(ঘ)

উদ্দীপকে বর্নিত নারী প্রকৃত পক্ষে একজন আল্লাহভক্ত মহিয়সী নারী হিসেবে অনুসরনযোগ্য। একজন মুসলিম নারী ইবাদাতের ক্ষেত্রে এরূপ হওয়াই বাঞ্চনীয়।

ইসলামে নারীকে অনেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সে হিসাবে একজন নারী যদি স্বামীর হুকুম মেনে চলে এবং সংসার পরিচালনায় তার দায়িত্বটুকু পালন করে, আর আল্লাহর বিধান মেনে চলে তা হলে তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা একান্ত সহজ। স্বামীদের উপর আল্লাহপাক স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব অর্পন করেছেন। এদিক থেকে নারীদের আল্লাহর ইবাদাত করার সুযোগ অনেক বেশি। ইসলাম নারীকে দিয়েছে মায়ের মর্যাদা, স্ত্রীর মর্যাদা, বোনের মর্যাদা। অনেক ক্ষেত্রেই নারীদের বাইরের দায়িত্ব খুবই কম। তাই নারীদের জন্য ইবাদাত বন্দেগী অনেক
সহজ। পৃথিবীতে এমন অনেক মহীয়সী নারীর আগমন ঘটেছিল যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমন- আছিয়া (রাঃ), মরিয়ম (আঃ), ফাতেমা (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হজরত খাদিজা (রাঃ), রাবেয়া বসরী (রহঃ) প্রমূখ অনেক নারীই আজকে নারী সমাজের জন্য উদাহরণ হয়ে আছেন। উদ্দীপকের মহীয়সী নারী গৃহকর্মীর কাজ করেও রাতভর আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকেন। এ দৃশ্য তার মনিব কে সদয় হতে সাহায্য করেছে। আমাদের বইতেও তেমনি একজন মহীয়সী নারী রাবেয়া বসরী (রহঃ) এর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সুতরাং আমাদের মুসলিম নারী সমাজের উপরোক্ত নারীদের অনুকরণ ও অনুসরণ করা উচিত।

প্রধান পরীক্ষক'গণের স্বাক্ষর